নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২৫. হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাক্কী জীবন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সামাজিক অবস্থা (الحالة الاجتماعية)

(ক) গোত্রীয় সমাজ ব্যবস্থা (المجتمع القبائلى) : আরবদের সামাজিক ব্যবস্থা ছিল গোত্রপ্রধান। যার কারণে বংশীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্ককে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হ’ত। মারামারি ও হানাহানিতে জর্জরিত উক্ত সমাজে কেবল গোত্রীয় ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধনের উপর নির্ভর করেই তাদের টিকে থাকতে হ’ত। ন্যায়-অন্যায় সবকিছু নির্ণীত হ’ত গোত্রীয় স্বার্থের নিরিখে। আজকালকের কথিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থায় যে উৎকট দলতন্ত্র আমরা লক্ষ্য করছি, তা জাহেলী আরবের গোত্রীয় সমাজব্যবস্থার সঙ্গে অনেকটা তুলনীয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদের চাইতে নিম্নতর অবস্থায় পৌঁছে গেছে। গোত্র সমূহের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। সেকারণ তারা অধিক সংখ্যায় পুত্র সন্তান কামনা করত। অধিক সংখ্যক ভাই ও পুত্র সন্তানের মালিককে সবাই সমীহ করত। যুদ্ধে পরাজিত হ’লে অন্যান্য সম্পদের সাথে নারীদের লুট করে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে অথবা দরিদ্রতার কারণে অনেকে তাদের কন্যাসন্তানকে শিশুকালেই হত্যা করে ফেলত। তাদের কোন গোত্রীয় আর্থিক রিজার্ভ ছিল না। যুদ্ধ শুরু হ’লে সবাই প্রয়োজনীয় ফান্ড গোত্রনেতার কাছে জমা দিত ও তা দিয়ে যুদ্ধের খরচ মেটাত। তবে পূর্ব থেকে ধর্মীয় রীতি চলে আসার কারণে তারা বছরে চারটি সম্মানিত মাসে (যুল-ক্বা‘দাহ, যুলহিজ্জাহ, মুহাররম ও রজব) যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখতো। এটা ছিল তাদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ধর্মীয় রক্ষাকবচ। গোত্রনেতাগণ একত্রে বসে সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করা, কোন গোত্রের সাথে যুদ্ধ শুরু বা শেষ করা কিংবা সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতেন। মক্কার ‘দারুন নাদওয়া’(دار الندوة) ছিল এজন্য বিখ্যাত।[1] তাদের মধ্যে মদ্যপানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। যুদ্ধ ও পেশীশক্তিই ছিল বিজয় লাভের মানদন্ড। আরবের সামাজিক অবস্থাকে এক কথায় বলতে গেলে Might is Right তথা ‘জোর যার মুল্লুক তার’ নীতিতে পরিচালিত হ’ত। আজকের বিশ্ব ব্যবস্থা তার চাইতে মোটেও উন্নত নয়। পাঁচটি ‘ভেটো’ ক্ষমতাধারী রাষ্ট্রই বলতে গেলে বিশ্ব শাসন করছে।

(খ) অর্থনৈতিক অবস্থা (الاقتصاد) : ব্যবসা ছিল তাদের প্রধান অবলম্বন। ত্বায়েফ, সিরিয়া, ইয়ামন প্রভৃতি উর্বর ও উন্নত এলাকা ছাড়াও সর্বত্র পশু-পালন জনগণের অন্যতম প্রধান অবলম্বন ছিল। উট ছিল বিশেষ করে দূরপাল্লার সফরের জন্য একমাত্র স্থল পরিবহন। গাধা, খচ্চর মূলতঃ স্থানীয় পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হ’ত। ঘোড়া ছিল যুদ্ধের বাহন। মক্কার ব্যবসায়ীরা শীতকালে ইয়ামনে ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় দূরপাল্লার ব্যবসায়িক সফর করত। আর্থিক লেনদেনে সূদের প্রচলন ছিল। তারা চক্রবৃদ্ধি হারে পরস্পরকে সূদভিত্তিক ঋণ দিত। রাস্তা-ঘাটে প্রায়ই ব্যবসায়ী কাফেলা লুট হ’ত। সেজন্য সশস্ত্র যোদ্ধাদল নিয়ে তারা রওয়ানা হ’ত। তবে কা‘বাগৃহের খাদেম হওয়ার সুবাদে মক্কার ব্যবসায়ী কাফেলা বিশেষভাবে সম্মানিত ছিল এবং সর্বত্র নিরাপদ থাকত। বছরের আট মাস লুটতরাজের ভয় থাকলেও হারামের চার মাসে তারা নিশ্চিন্তে ব্যবসা করত। এই সময় ওকায, যুল-মাজায, যুল-মাজান্নাহ প্রভৃতি বড় বড় বাজারে বাণিজ্যমেলা ছাড়াও আরবের বিভিন্ন প্রান্তে আরও অনেকগুলি বড় বড় মেলা বসত। এইসব বাণিজ্য মেলায় প্রচুর বেচাকেনার মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা লাভবান হ’ত। তাদের মধ্যে বস্ত্র, চর্ম ও

ধাতব শিল্পের প্রচলন ছিল। ইয়ামন, হীরা, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল এইসব শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল। তবে গৃহের আঙিনায় বসে সূতা কাটার কাজে অধিকাংশ আরব মহিলা নিয়োজিত থাকতেন। কোন কোন এলাকায় কৃষিকাজ হ’ত। ছোলা, ভুট্টা, যব ও আঙ্গুরের চাষ হ’ত। মক্কা-মদীনায় গমের আবাদ ছিল না। মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকালে প্রথম সিরিয়া থেকে মদীনায় গম রফতানী হয়। খেজুর বাগান ব্যাপক হারে দেখা যেত। খেজুর ছিল তাদের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা।

তাদের কোন গোত্রীয় অর্থনৈতিক ফান্ড ছিল না। সেকারণ সমাজের লোকদের দারিদ্র্য ও রোগ-ব্যধি দূরীকরণে ও স্বাস্থ্যসেবার কোন সমন্বিত কর্মসূচী ও কর্মপরিকল্পনা তাদের ছিল না। ফলে পারস্পরিক দান ও বদান্যতার উপরেই তাদের নির্ভর করতে হ’ত। নিখাদ পুঁজিবাদী অর্থনীতি চালু ছিল। যার ফলে সমাজে একদল উচ্চবিত্ত থাকলেও অধিকাংশ লোক ছিল বিত্তহীন। সাধারণ অবস্থা ছিল এই যে, আরবদের সহায়-সম্পদ তাদের জীবনমান উন্নয়নে ব্যয়িত না হয়ে সিংহভাগই ব্যয়িত হ’ত যুদ্ধ-বিগ্রহের পিছনে। ফলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। আরবীয় সমাজে উচ্চবিত্ত লোকদের মধ্যে মদ-জুয়া ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন ছিল। সেখানে বিত্তহীনরা দাস ও দাসীরূপে বিক্রয় হ’ত ও মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হ’ত।

কুরায়েশরা পরস্পরে ব্যবসায়ে জড়িত ছিল। হাশেম বিন ‘আব্দে মানাফ গোত্রনেতাদের মধ্যে এই পারস্পরিক ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আবির্ভাবকালীন সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। যাকে ‘ঈলাফ’ (إِيلاف) বলা হয়। যারা শীতকালে ইয়ামনে ও গ্রীষ্মকালে শামে ব্যবসায়িক সফর করত। একথাটিই কুরআনে এসেছে সূরা কুরায়েশ-এ। তারা সমুদ্র পথে চীন ও হিন্দুস্থানেও ব্যবসা করত।

হাশেম বিন ‘আব্দে মানাফ তৎকালীন দুই বিশ্বশক্তি রোম ও পারস্য সম্রাটদের সাথে চুক্তিক্রমে তাদের দেশেও ব্যবসা পরিচালনা করেন। এভাবে মক্কার অর্থনীতির ভিত গড়ে ওঠে ব্যবসার উপরে। অস্ত্র শিল্প ও আসবাবপত্র শিল্প ব্যতীত তেমন কোন শিল্প তাদের মধ্যে ছিল না। অর্থনীতির অন্য একটি ভিত্তি ছিল পশু পালন। যা ছিল আপামর জনসাধারণের নাগালের মধ্যে। ব্যবসায়ী নেতারা সূদের ভিত্তিতে ঋণদান করত। ফলে সেখানে ধনী ও গরীবের মধ্যে পাহাড় প্রমাণ বৈষম্য সৃষ্টি হয়। মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণী বিলাস-ব্যসনের মধ্যে বসবাস করলেও মক্কায় অধিকাংশ অধিবাসী ছিল নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন। মক্কার নেতৃবৃন্দ ও ব্যবসায়ীগণ সারা আরবে সম্মানিত ছিলেন। কা‘বাগৃহের কারণে তাদের মর্যাদা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই সাথে মক্কা ছিল সর্বদা বহিঃশক্তির হামলা থেকে সুরক্ষিত।

(গ) নারীদের অবস্থা (حالة النساء) : তৎকালীন আরবে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন বসবাস করত। সেখানকার অভিজাত শ্রেণীর লোকদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে খুবই উন্নত ছিল। পরিবারে পুরুষ ও মহিলাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল মর্যাদা ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত। অভিজাত পরিবারের মহিলাদের মান-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা হ’ত। তাদের মর্যাদা হানিকর কোন অবস্থার উদ্ভব ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তরবারি কোষমুক্ত হয়ে যেত। মহিলাদের মর্যাদা এতই উঁচুতে ছিল যে, বিবদমান গোত্রগুলিকে একত্রিত করে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনেও তারা সক্ষম হ’ত। পক্ষান্তরে তাদের উত্তেজিত বক্তব্যে ও কাব্য-গাথায় যেকোন সময় দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারত। ওহোদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তার সাথী মহিলাদের নিয়ে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে একাজটিই করেছিলেন। তাদের মধ্যে বিবাহ পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের। উভয় পক্ষের অভিভাবকগণের সম্মতি ও কনের স্বীকৃতি লাভের পর বর কনেকে নির্ধারিত মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে করতে পারত। বিয়েতে ও সন্তানের আকীকাতে সমাজনেতাদের দাওয়াত দিয়ে ধুমধামের সাথে অনুষ্ঠান করা তাদের

সামাজিক রেওয়াজ ছিল।

সাধারণ ও দরিদ্র শ্রেণীর আরবদের মধ্যে চার ধরনের বিবাহ চালু ছিল। এক ধরনের ছিল অভিজাত শ্রেণীর মত পারস্পরিক সম্মতি ও মোহরানার বিনিময়ে বিবাহ পদ্ধতি। কিন্তু বাকী তিনটি পদ্ধতিকে বিবাহ না বলে স্পষ্ট ব্যভিচার বলা উচিত। যা ভারতীয় হিন্দু সমাজে রাক্ষস বিবাহ, গান্ধর্ব্য বিবাহ ইত্যাদি নামে আধুনিক যুগেও চালু আছে বলে জানা যায়। আরবীয় সমাজে স্বাধীনা ও দাসী দু’ধরনের নারী ছিল। স্বাধীনাগণ ছিলেন সম্মানিত। কিন্তু দাসীরা বাজার-ঘাটে বিক্রয় হ’ত। মনিবের দাসীবৃত্তিই ছিল তাদের প্রধান কাজ।

(ঘ) নৈতিক অবস্থা (الأخلاق) : উদার মরুচারী আরবদের মধ্যে নৈতিকতার ক্ষেত্রে দু’টি ধারা একত্রে পরিলক্ষিত হ’ত। একদিকে যেমন তাদের মধ্যে মদ্যপান, ব্যভিচার, মারামারি ও হানাহানি লেগে থাকত। অন্যদিকে তেমনি দয়া, উদারতা, সততা, পৌরুষ, সৎসাহস, ব্যক্তিত্ববোধ, সরলতা ও অনাড়ম্বরতা, দানশীলতা, আমানতদারী, মেহমানদারী, প্রতিজ্ঞা পরায়ণতা ইত্যাদি সদগুণাবলীর সমাবেশ দেখা যেত। তাদের মধ্যে দুঃসাহসিকতা ও বেপরোয়া ভাবটা ছিল তুলনামূলকভাবে বেশী। তাদের মধ্যে যেমন অসংখ্য দোষ-ত্রুটি ছিল, তেমনি ছিল অনন্যসাধারণ গুণাবলী, যা অন্যত্র কদাচিৎ পাওয়া যেত। তাদের সৎসাহস, আমানতদারী, সত্যবাদিতা, কাব্য প্রতিভা, স্মৃতিশক্তি, অতিথিপরায়ণতা ছিল কিংবদন্তীর মত। তাদের কাব্যপ্রিয়তা এবং উন্নত কাব্যালংকারের কাছে আধুনিক যুগের আরবী কবি-সাহিত্যিকরা বলতে গেলে কিছুই নয়। তাদের স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, একবার শুনলেই হুবহু মুখস্থ বলে দিত। বড় বড় ক্বাছীদা বা দীর্ঘ কবিতাগুলি তাদের মুখে মুখেই চালু ছিল। লেখাকে এজন্য তারা নিজেদের জন্য হীনকর মনে করত। দুর্বল স্মৃতির কারণে আজকের বিশ্ব লেখাকেই অধিক গুরুত্ব দেয়। অথচ লেখায় ভুল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তৎকালীন আরবদের স্মৃতিতে ভুল কদাচিৎ হ’ত। সম্ভবতঃ এই সব সদগুণাবলীর কারণেই বিশ্বনবীকে আল্লাহ মক্কাতে প্রেরণ করেন। যাদের প্রখর স্মৃতিতে কুরআন ও হাদীছ অবিকৃত অবস্থায় নিরাপদ থাকে এবং পরবর্তীতে তা লিখিত আকারে সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়। যদিও কুরআন ও হাদীছ লিখিতভাবেও তখন সংকলিত হয়েছিল।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল আরব ভূখন্ডের মরুচারী মানুষেরা বিভিন্ন দুর্বলতার অধিকারী হ’লেও তাদের মধ্যে উন্নত মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঈর্ষণীয়ভাবে পরিদৃষ্ট হ’ত। আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার অবতরণস্থল হওয়ার কারণে এই ভূখন্ড থেকেই মানব সভ্যতা ক্রমে পৃথিবীর অন্যান্য ভূখন্ডে বিস্তার লাভ করেছে। এই ভূখন্ডে আরাফাত-এর না‘মান উপত্যকায় সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ পাক সমস্ত মানবকুলের নিকট হ’তে তাঁর প্রভুত্বের স্বীকৃতি ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।[2] যা ‘আহ্দে আলাস্তু’ নামে খ্যাত। একই সাথে তিনি সকল নবীর কাছ থেকে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে ঈমান আনা ও তাঁকে সর্বতোভাবে সহযোগিতার অঙ্গীকার নেন (আলে ইমরান ৩/৮১)।

এই ভূখন্ডেই হাযার হাযার নবী ও রাসূলের আগমন ঘটেছে। এই ভূখন্ডেই আল্লাহর ঘর কা‘বাগৃহ এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস অবস্থিত। এই ভূখন্ড বাণিজ্যিক কারণে সারা বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। জান্নাতের ভাষা আরবী এই ভূখন্ডের কথিত ও প্রচলিত ভাষা ছিল। সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, প্রখর স্মৃতিশক্তি এবং সততা ও আমানতদারীর অনুপম গুণাবলীর প্রেক্ষাপটে আরবভূমির কেন্দ্রবিন্দু মক্কাভূমির অভিজাত বংশ কা‘বাগৃহের তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটেই আল্লাহ মানবজাতির কল্যাণে প্রেরিত সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠতম নে‘মত কুরআন ও সুন্নাহর পবিত্র আমানত সমর্পণ করেন। ফালিল্লা-হিল হাম্দ ওয়াল মিন্নাহ।

ফুটনোট

[1]. ‘দারুন নাদওয়া’ ছিল হারাম সংলগ্ন কুছাই বিন কেলাবের বাড়ী। বর্তমানে এটি মাসজিদুল হারামের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে।

[2]. আ‘রাফ ৭/১৭২-১৭৩; আহমাদ হা/২৪৫৫; মিশকাত হা/১২১ ‘ঈমান’ অধ্যায় ‘তাক্বদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5149

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন